দশম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে -- শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কীর্তনানন্দে

ঠাকুর অধরের বাড়ি হইতে কলহান্তরিতা কীর্তন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ি আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি।

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল এক্‌জামিনার হইয়াছিলেন ও Science Association-এ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থে বাড়িটি নির্মাণ করিয়াছেন। এ-স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র শ্রীগুরুর করুণাবলে বিদ্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি করিতেন -- বলিতেন, রাম বাড়িতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তাদের বাড়ি ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ), রামচন্দ্রের একরকম বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়িতে ৺নারায়ণের নিত্য সেবা।

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন -- ফুলদোলের দিন -- এই ভদ্রাসন বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসিবেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ওই দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রামচন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিষ্যেরা এখনও অনেকে ওই দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাড়ি উৎসব! প্রভু আসিবেন। রাম শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথামৃত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠান কিন্তু তাহার ভিতরই কত পরিপাটি। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথকঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময় বলরাম ও অধরের বাড়ি হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা। কাছে মাস্টার।

[*রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ*]

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, “মহারাজ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৺কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে, তোমার সহধর্মিণী শৈব্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পৌঁছাইয়া দিই। সেইখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে।” এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান বিশ্বামিত্র ৺কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া সকলে ৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন করিলেন।

৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট; ‘শিব’ ‘শিব’ এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না -- কাজে কাজেই শৈব্যাকে বিক্রয় করিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথকঠাকুর শৈব্যার প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ি রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্পদংশন কথাও বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু হইল। সৎকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শয্যা ত্যাগ

করিয়া উঠিলেন না -- শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও অশনিপাত -- নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক-একবার বিদ্যুৎ খেলেতেছিল। শৈব্যা ভয়াকুলা শোকাকুলা, -- রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছেন। তিনি শ্মশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন। কড়ি লইয়া সৎকার কার্য সম্পাদন করিবেন। কত শবদেহ জ্বলিতেছে, কত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন -- সে ক্রন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্‌ দেহধারী জীবের হৃদয় বিগলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন -- একেবারে স্থির -- একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উদ্‌গত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন?

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলে ঁবিশ্বেশ্বর-দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথকঠাকুর কথা সাঙ্গ করিলেন। ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলেন। কথা সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে ভক্তমণ্ডলী, কথকঠাকুরও কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, "কিছু উদ্ধব-সংবাদ বল।"

[*মুক্তি ও ভক্তি -- গোপীপ্রেম -- গোপীরা মুক্তি চান নাই*]

কথক বলিলেন, যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন। তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন?" এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই মাঠে গরু চড়াইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন। এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন; এইসকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন।" উদ্ধব বলিলেন, "আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।" গোপীরা বলিলেন, "আমরা ও-সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, ইনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।" উদ্ধব বলিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ-সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়।" গোপীরা বলিলেন, "আমরা মুক্তি -- এ-সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, "গোপীরা ঠিক বলেছেন।" এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুরকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন:

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি) -- গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব,

তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বললে, “সীতা-রাম দেখব।” ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, “তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।” পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়া প্রণাম করতে লাগল। বিভীষণ বললেন, “আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করব, আর কারুকে করব না।” তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে।

“কিরকম জানো? যেমন বাড়ির বউ! দেওর, ভাশুর, শ্বশুর, স্বামী -- সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্বন্ধ।

“এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। ‘অহংতা’ আর ‘মমতা’। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর ‘মমতা’ -- আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন, ‘মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।’ যশোদা বললেন, ‘ওরে, তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি। -- চিন্তামণি না, আমার গোপাল।’

“গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে সভায় ঢুকল। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ি-বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগল, ‘এ পাগড়ি-বাঁধা আবার কে! এঁর সঙ্গে আলাপ কল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব! আমাদের পীতধড়া, মোহনচূড়া-পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়!’

“দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না।”

[*গোপীদের নিষ্ঠা -- জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি*]

ভক্ত -- কোন্‌টি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর ‘আমার’ জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, “ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!” একজন বললে, “কেন? মারা যাব কেন? এর ঈশ্বরকে ডাকি।” আর-একজন বললে, “না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।”

“যে লোকটি বললে, ‘আমরা মারা গেলুম’, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, ‘এস, আমার ঈশ্বরকে ডাকি’, সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে, ইশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করেছেন। আর যে বললে, ‘তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস, গাছে উঠি,’ তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই -- আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।”

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়া গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন।